সচিত্র কিশোর ক্লাসিক সিরিজ ০১

আ জার্নি টু দ্য সেন্টার অফ দি আর্থ

জুল ভার্ন

অলঙ্করণ : ব্রেন্ডন লিঞ্চ

রূপান্তর

সাদিয়া ইসলাম বৃষ্টি

বেঙ্গলবুকস

প্র কা শ ক
মাহমুদুল হাসান
বেঙ্গলবুকস
নোভা টাওয়ার, ২/১ নয়া পল্টন, ঢাকা ১০০০
বিশাল বুক কমপ্লেক্স, ৩৭ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
ফোন : +88 01958519882, +88 01958519883
পরিবেশক : কিন্ডারবুকস, বেঙ্গলবুকস

বইটির কোনো অংশ বা সম্পূর্ণ বই কম্পোজ বা ফটোকপি আকারে বিক্রয় বা সরবরাহ অবৈধ। এ বইয়ের কোনো লেখা বা চিত্র হুবহু, পরিমার্জন বা পরিবর্ধন করে ছাপানো এমনকি কোনো ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রের মাধ্যমে সংরক্ষণ করা কপিরাইট আইন, ২০২৩ অনুযায়ী দণ্ডনীয়।

ISBN : 978-984-99064-2-1

www.bengalbooks.com.bd
email : info@bengalbooks.com.bd

আ জা র্নি টু দ্য সে ন্টা র অ ফ দি আ র্থ
জুল ভার্ন
রূপান্তর : সাদিয়া ইসলাম বৃষ্টি

প্রথম প্রকাশ : অমর একুশে বইমেলা ২০২৫
কপিরাইট © প্রকাশক
প্রচ্ছদ : আজহার ফরহাদ
বর্ণবিন্যাস ও কম্পিউটার গ্রাফিক্স : ক্রিয়েটিভ ডিজাইন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট
মুদ্রণ : প্রিন্ট ওয়ার্কস, ২৯ মিরপাড়া, আমুলিয়া রোড, ডেমরা, ঢাকা-১৩৬০
অনলাইন ডিস্ট্রিবিউটর : রকমারি ডট কম, বাতিঘর ডট কম
ভারতে পরিবেশক : ধ্যানবিন্দু, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা
যুক্তরাজ্য পরিবেশক : সঙ্গীতা লিমিটেড, ২২ ব্রিকলেন, লন্ডন
যুক্তরাষ্ট্র পরিবেশক : মুক্তধারা, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক

মূল্য : ১৮০ টাকা

A Journey to the Center of the Earth Novel by Jules Verne
Translated by Sadia Islam Bristi
First published in hardback in Bangladesh by BengalBooks in 2025
Copyright reserved by the Publisher

Printed and bound in Bangladesh

জুল ভার্ন

১৯২৮ সালে ফ্রান্সের নান্তেসে জন্মগ্রহণ করেন জুল ভার্ন। সাহিত্যে জুল ভার্নের প্রবেশ ঘটে মঞ্চনাটক লেখার মাধ্যমে। তিনি অসামান্য সব বিজ্ঞান কল্পকাহিনি রচনার জন্য বিখ্যাত। *আ জার্নি টু দ্য সেন্টার অফ দি আর্থ (১৮৬৪), টুয়েন্টি থাউজেন্ড লীগ আন্ডার দ্য সি'স (১৮৭০), অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড ইন এইট্টি ডে'জ (১৮৭২)*-সহ একাধিক বেস্টসেলিং রোমাঞ্চকর আভিযানিক উপন্যাসের জনক তিনি।

এক নৈশভোজে দুই বিজ্ঞানীর সঙ্গে আলাপ হয় লেখকের। ইতালির স্ট্রম্বলির আগ্নেয় দ্বীপ থেকে ফিরে আসার গল্প করছিলো তারা। তাদের কথা শুনেই *আ জার্নি টু দ্য সেন্টার অফ দি আর্থ* বইটির চিন্তা আসে লেখকের মাথায়। অবাক হয়ে ভেবেছিলেন, এই মানুষ দুটো জ্বালামুখ বেয়ে নিচে গিয়ে আবার ফিরেও এসেছে পৃথিবীর উপরিভাগে! নিজের কল্পনায় সেই অভিযানকে উপন্যাসে রূপায়ন করেন জুল ভার্ন।

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায় রুনিক ম্যানুস্ক্রিপ্ট ০৭
দ্বিতীয় অধ্যায় শুরু হলো অভিযান ২৭
তৃতীয় অধ্যায় পৃথিবীর পেটে ৪৫
চতুর্থ অধ্যায় শেষ না হওয়া পথ ৫৯
পঞ্চম অধ্যায় পিপাসার দিনগুলো ৭৩
ষষ্ঠ অধ্যায় অবশেষে পানির খোঁজ ৮৭
সপ্তম অধ্যায় হারিয়ে গেছি ১০৩
অষ্টম অধ্যায় দেয়ালের ওপাশে ১১৫
নবম অধ্যায় মধ্য সাগর ১৩১
দশম অধ্যায় ভয়াবহ ঝড় ১৫৫
একাদশ অধ্যায় আদিম এক পৃথিবী ১৭১
দ্বাদশ অধ্যায় আগ্নেয়গিরির মুখে ১৯১
ত্রয়োদশ অধ্যায় শেষ হলো অভিযান ২০৩
চতুর্দশ অধ্যায় বাড়ি ফেরার পালা ২১১

প্রফেসর হার্ডউইগ

প্র থ ম অ ধ্যা য়

রুনিক ম্যানুস্ক্রিপ্ট

সে দিনটার কথা জীবনেও ভুলতে পারবো না আমি। এরপর অনেকগুলো দিন পার হয়ে গেছে। তাও পেছনে তাকালে গায়ের রোম খাড়া হয়ে ওঠে। এমন কিছু ঘটেছে যা বিশ্বাসই হতে চায় না। এত অসাধারণ একেকটা ব্যাপার ছিল, আজকের দিনে এসেও ভাবলে অবাক হয়ে যাই।

আমি তখন থাকি আমার এক জার্মান চাচার সঙ্গে। দর্শন আর রসায়ন তো আছেই, এছাড়াও জিওলজি, মিনারেলজি ইত্যাদি আরও গোটাকতক 'লজি'র অধ্যাপক তিনি।

পৃথিবীর ভেতরটা সম্পর্কে জানার অসম্ভব আগ্রহ ছিলো আমার। সে আগ্রহ দেখেই আমার চাচা অধ্যাপক হার্ডউইগ আমাকে নিজের কাছে ডেকে নেন। তার সঙ্গে থেকেই নানান বিষয়ে জানতে শুরু করি।

চাচা যে-সে মানুষ ছিলেন না। বাঘা বাঘা বিজ্ঞানীদের

সঙ্গে নানান ভাষায় হরদম কথা বলে যেতেন তিনি। কোনো জিনিস বাইরে থেকে দেখেই বলে দিতে পারতেন তার ধরন। প্রায় ছয়শ ভূতাত্ত্বিক নমুনা আলাদাভাবে ধরতে পারতেন চাচা। তবে এসব নিয়ে তার অহংকার ছিলো না মোটেও!

পঞ্চাশ বছর বয়সি আমার চাচা—লম্বা, পাতলা, একহারা গড়নের। বিশাল চশমার পেছনে লুকানো থাকতো তার গোল গোল ছানাবড়া চোখদুটো। ফাইলের মতো সরু নাক দিয়ে প্রতিনিয়ত তামাকের ধোঁয়া উড়তো। হাঁটতে হাঁটতে মুঠি পাকিয়ে বিড়বিড় করতেন তিনি। যেন আরেকটু হলেই ঘুসি মারবেন কাউকে। তবে চাচা বেশ নিরীহ মানুষ ছিলেন। মুঠো শক্ত করে সাবধানে এক গজ করে এগিয়ে যেতেন তিনি। এত সাবধানী কেন কে জানে! একা থাকতেই ভালোবাসতেন চাচা। বন্ধুবান্ধবও তেমন ছিলো না তার।

তবে তাই বলে অধ্যাপক হার্ডউইগকে কোনোভাবেই বাজে লোক বলা যাবে না। আমার কাছে অধ্যাপকের সঙ্গে থাকা মানেই ছিলো তাকে মান্য করে চলা। তাই একদিন বাড়ি ফিরে যখন চাচা 'হ্যারি...হ্যারি...হ্যারি' বলে চিৎকার জুড়ে দিলেন, তড়িঘড়ি ছুটলাম আমি। পেটে ছুঁচো দৌড়াচ্ছিলো। খাবারের দিকে মন পড়ে আছে। সেগুলোকে পাত্তা দিলাম না।

প্রতি কদমে তিন সিঁড়ি লাফিয়ে চাচার গবেষণাগারে ঢুকলাম। গবেষণাগারটিকে অবশ্য জাদুঘর বললেই ভালো

চাচার ডাক শুনে দৌড়ে গেলাম

মানায়। চারপাশে খনিজ পদার্থ ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখা। আমার উপস্থিতি প্রথমে টেরই পেলেন না তিনি।

'দারুণ!' হাতের বইটা পড়তে পড়তে বলে উঠলেন চাচা, 'অসাধারণ!'

তাকিয়ে দেখলাম। দৃশ্যটা খুব পরিচিত। চাচা এমন পুরনো হলদেটে বই পড়তেই পছন্দ করেন বেশি।

'ডেকেছেন চাচা?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'দেখ, স্নোরি টার্লসনের *হেইমস-ক্রিঙ্গলা*।' হাতের বইটা ঝাঁকালেন তিনি। 'দ্বাদশ শতাব্দীর বিখ্যাত আইসল্যান্ডীয় লেখক। আইসল্যান্ডে রাজত্ব করা নরওয়েজিয়ান রাজপুত্রের সত্য কাহিনিগুলো লিখেছেন।'

'কোন ভাষায় লেখা?' লেখা জার্মানে হলে পড়তে পারবো এই আশায় জিজ্ঞেস করলাম। সে আশায় গুড়েবালি। চাচা অনুবাদ পড়েন না, আসল ভাষাটাই চেখে দেখেন সবসময়।

'রুনিক ম্যানুস্ক্রিপ্ট, বুঝলি?' আমাকে বললেন তিনি। 'আইসল্যান্ডের আদি অধিবাসীদের ভাষা।'

বইটা তুলে ধরে ভাষাটা আমাকে দেখাতে গেলেন চাচা, আর তখনই ঘটলো ঘটনাটা। হলদেটে পাতার ভেতর থেকে টুক করে খসে পড়লো একটা কাগজ।

ক্ষুধার্তের খাবার ছিনিয়ে নেয়ার মতো মেঝে থেকে কাগজটা ছোঁ মেরে তুলে নিলেন চাচা। অদ্ভুত সব অক্ষরে

'অসাধারণ!'

মোড়া তিন বাই পাঁচ ইঞ্চির এক প্রাচীন পার্চমেন্ট।

'রুনিক' কাঁপা কাঁপা আঙুলে কাগজটা ধরে বললেন চাচা।

ভালো করে দেখলাম। কে জানতো এ ছোট্ট চামড়ার কাগজটা এত ভোগান্তি নিয়ে আসবে। এমন কোথাও নিয়ে যাবে যেখানে আজ অবধি মানুষের পা পড়েনি!

চাচা রুনিক পড়তে পারলেও কাগজে কী লেখা আছে বুঝলেন না। তখনই ডাক এলো রাঁধুনির। ডিনার প্রস্তুত।

'এখন এসব ডিনার-ফিনার হবে না আমাকে দিয়ে,' চেঁচালেন তিনি।

আমি অবশ্য দেরি করলাম না। খিদে লেগেছিলো, দ্রুত খেতে চলে গেলাম। শেষ পাতে মিষ্টি আর ওয়াইন খাচ্ছি, এমন সময় চাচার গর্জন শোনা গেলো। ডাকছেন আমাকে। আমি প্রায় উড়ে চলে গেলাম চাচার স্টাডিরুমে।

কাগজটার দিকে তাকিয়ে আছেন তিনি। 'এটা রুনিকই।' চেঁচিয়ে বললেন। 'কিন্তু একটু অদ্ভুত। মনে হচ্ছে কোনো

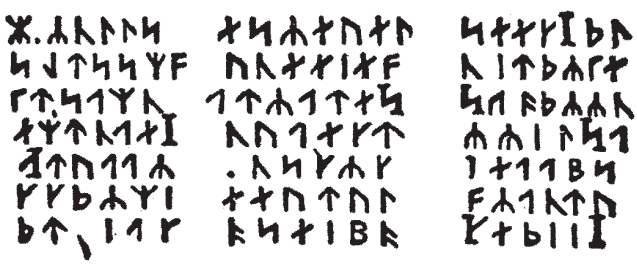

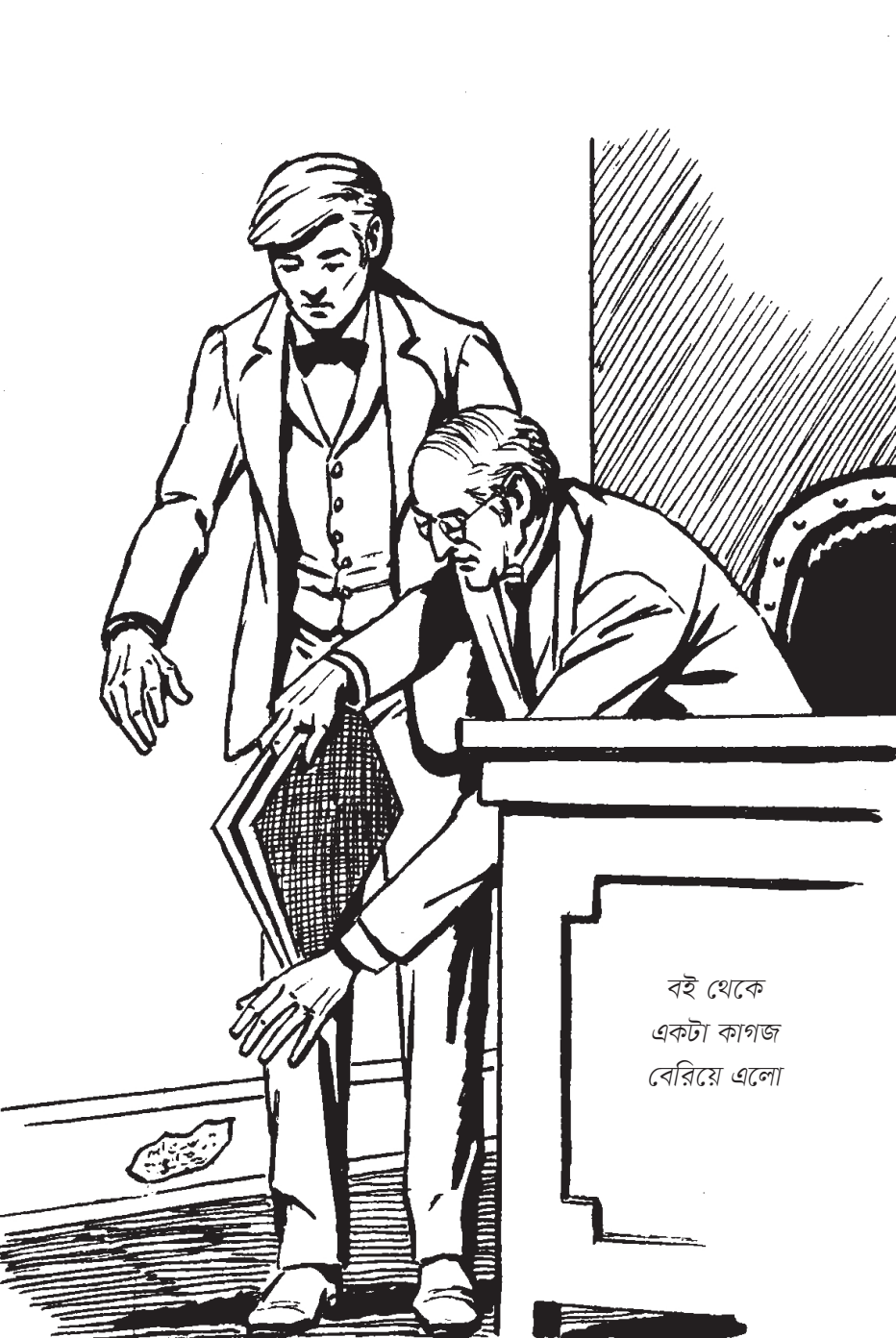
বই থেকে
একটা কাগজ
বেরিয়ে এলো

গোপন কথা লেখা আছে, বুঝলি? কী লেখা বুঝতে পারছি না। তবে না বোঝা পর্যন্ত ঘুমাতে পারবো না এটা নিশ্চিত।'

কাগজের অক্ষরগুলোর দিকে তাকালাম। বুঝলাম না কিছু—

'বস!' গরম চোখে তাকালেন চাচা। 'যা বলছি লিখে ফেল।'

বাধ্য ছেলের মতো কথা শুনলাম।

'রুনিক অক্ষরগুলোর জায়গায় আমাদের অক্ষর বসিয়ে দেখি,' বললেন তিনি। 'দেখি কোনো মানে বের হয় কি না।'

মোট একুশটা অক্ষর বললেন আমাকে তিনি। তবে তাতেও খুব যে কিছু বোঝা গেলো এমন না।

m.rnlls	*nicdrke*	*.nscrc*
sgtssmf	*Saodrrn*	*eeutul*
kt,samn	*emtnael*	*oseibo*
esruel	*Atvaar*	*rrilSa*
unteief	*ccdrmi*	*ieaabs*
atrateS	*dt,iac*	*frantu*
seecJde	*nuaect*	*Kediil*

লেখা শেষ হয়েছে কি হয়নি, আমার হাত থেকে খপ্ করে কাগজ টেনে নিলেন চাচা। গভীর মনোযোগ দিয়ে দেখলেন কিছুক্ষণ।

'গুরুত্বপূর্ণ কিছু একটা আছে এখানে, বুঝলি হ্যারি?'

আমাকে তো বটেই, মনে হলো নিজেকেও কথাগুলো শোনালেন।

বোকার মতো তার দিকে তাকিয়ে থাকলাম আমি।

'ক্রিপ্টোগ্রাফ—একটা ধাঁধার কথা মনে পড়ে যাচ্ছে এটা দেখে,' চাচা বললেন আবার। 'বুঝলি, মনে হচ্ছে এর মানে বের করতে পারলে বেশ বড় একটা আবিষ্কার করা হবে।'

আমার কাছে পুরো ব্যাপারটাই সময় নষ্ট মনে হচ্ছিলো। তবে চাচার যে রাগ! মনের কথা মনেই চেপে রাখলাম।

'পার্চমেন্ট আর বই, দুটো জিনিস দুইজন লিখেছেন। বইয়ের বয়স পার্চমেন্টের চেয়ে অন্তত ২০০ বছরের বেশি। তার মানে এ চামড়ার কাগজে যে লিখেছে সে বইটার প্রথম নয়, দ্বিতীয় মালিক। প্রশ্ন হলো, দ্বিতীয় মালিকটি কে তাহলে?'

প্রচ্ছদের নিচে এক জায়গায় কালির মতো কী যেন একটা মাখানো। তবে কাছ থেকে দেখলেই বোঝা যায়, কালি না। খুব ছোট করে কিছু একটা লেখা সেখানে। সময়ের ধাক্কায় হালকা হয়ে গেছে। চাচা পড়তে শুরু করলেন—

'আর্নে সাকনুসেম!' উত্তেজনায় চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি। 'তার মানে বইটা আর্নে সাকনুসেমের ছিলো। ষষ্ঠ শতকে

'যা বলছি লেখ'

আইসল্যান্ডের বিখ্যাত অধ্যাপক আর রসায়নবিদ। এত বড় একজন মানুষ চামড়ার কাগজে এইসব রহস্যময় লেখা লিখেছেন যখন বড় কিছুই হবে নিশ্চয়, কী বলিস?'

উত্তেজনায় ঘরের এ-কোণ ও-কোণ করতে লাগলেন চাচা। 'এ শব্দগুলোর মানে জানার আগে ঘুম-খাওয়া কিছুই হবে না আমার!'

'কিন্তু চাচা...' বলার চেষ্টা করতেই থামিয়ে দিলেন চাচা। 'তুইও এখানেই থাকবি। তোরও ঘুম-নাওয়া-খাওয়া বন্ধ।'

খানিক আগেই ভরপেট খেয়ে নিয়েছি ভেবে বেশ খুশি লাগলো।

আমাদের জানা অজানা সবগুলো ভাষা মেলানোর চেষ্টা করলাম পার্চমেন্টের লেখাগুলোর সঙ্গে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাজ করেও কোনো লাভ হলো না। সাকনুসেমের সময়ের বিদ্বান ব্যক্তিরা নাকি লাতিন ভাষাই ব্যবহার করতেন। চাচার দৃঢ় বিশ্বাস এ পার্চমেন্টটাও লাতিনেই লেখা। তবে অনেক খুঁজেও পরিচিত কোনো লাতিন শব্দের সঙ্গে মিল পাওয়া গেলো না।

শেষমেশ নিজের বানানো কী এক থিওরি দিয়ে গোলমেলে ক্রিপ্টোগ্রাফটির সমাধান করতে বসলেন তিনি। আমি বিনা বাক্যব্যয়ে লিখতে থাকলাম।

কী মানে এর কে জানে! রেগেমেগে শেষে টেবিলে ঘুসি মেরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেন চাচা। নিচে সদর দরজা

বই আর পার্চমেন্টটা মিলিয়ে দেখছেন

দড়াম করে বন্ধ হওয়ার শব্দ কানে এলো শুধু।

আমি কোনো তাড়াহুড়োয় গেলাম না। ধীরেসুস্থে কিছুক্ষণ সিগারেট ফুঁকে পার্চমেন্টটা তুলে নিলাম আবার। এই রে! এ তো মনে হচ্ছে ভাঙা ভাঙা কিছু ইংরেজি, লাতিন আর ফ্রেঞ্চ শব্দের মিশেল। আমার তখন মাথা খারাপ হওয়ার জোগাড়!

উত্তেজনায় দমবন্ধ অবস্থা প্রায়। হাতের পার্চমেন্টের টুকরো দিয়েই বাতাস করতে লাগলাম। আর তক্ষুনি প্রথমবার পার্চমেন্টের পেছন দিকটায় চোখ গেলো।

পেছনে স্পষ্ট 'ক্রেটারেম বা ক্রেটার', মানে জ্বালামুখ, আর 'টেরেস্ট্রি', মানে পৃথিবী—এ শব্দগুলো দেখা যাচ্ছে। রহস্যের সমাধান করে ফেলেছি আমি! এখন কেবল শব্দগুলো উল্টো করে পড়লেই কেল্লাফতে।

mmessunkaSenrA.icefdoK.segnittamurtn
ecertserrette,rotaivsadua,ednecsedsadne
lacartniiiluJsiratracSarbmutabelednek
meretarcsilucoysleffenSnl.

বিস্ফারিত চোখে পার্চমেন্টটা পড়তে শুরু করলাম। উত্তেজনায় হাত কাঁপছে আমার। এমন চমকানো আমি জীবনেও চমকাইনি! আসলেই এমন কাজ করেছে কেউ! আসলেই কারো সাহস হয়েছে...কী অসম্ভব ব্যাপার!

পার্চমেন্ট নিয়ে পড়ে থাকলাম ঘণ্টার পর ঘণ্টা

না, এ পার্চমেন্ট কারো হাতে যেতে দেয়া যাবে না।

'কখনো না। চাচাকে এ গোপন তথ্য জানতে দেয়া যাবে না কোনোভাবেই!' উত্তেজিত কণ্ঠে নিজেকেই যেন বললাম আমি। কারণ, তাহলে আর ধরে রাখা যাবে না চাচাকে। বেরিয়ে পড়বেন তিনি কিছু না ভেবেই। এমন পাগলামি থেকে চাচাকে আমার বাঁচাতেই হবে। এক্ষুনি পুড়িয়ে ফেলতে হবে চামড়ার কাগজটা।

বই আর পার্চমেন্ট তুলে আগুনে ফেলতে যাচ্ছি এমন সময় ঘরে ঢুকলেন চাচা। তার সব মনোযোগ পার্চমেন্ট আর বইয়ের দিকে। সেগুলো দিয়ে আমি কী করতে যাচ্ছিলাম সেটা খেয়ালই করলেন না তিনি। জিনিসগুলো আমার থেকে নিয়ে বসে পড়লেন আবার। ভয়ের একটা কাঁপুনি টের পেলাম শরীরে। চাচা পার্চমেন্টের গোপন তথ্য জেনে যাবেন যেকোনো সময়।

কয়েক ঘণ্টা পেরিয়ে গেলো। তাও ঘর থেকে বেরোলাম না আমি। শেষমেশ সোফায় গিয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম।

জেগে দেখি তখনও লালচে চোখ, ধূসর চুল আর কাঁপা কাঁপা হাতে কাজ করছেন চাচা। লোকটাকে ভালোবাসি আমি। তার কষ্ট দেখতে ভালো লাগছিলো না। কিন্তু কিছু করারও যে নেই আমার। এমন অন্ধকারে পাঠাতে পারবো না আমি লোকটাকে।

ক্ষেপে গেলেন প্রফেসর!

এভাবেই রাত থেকে সকাল হলো, সকাল থেকে বিকেল। দুপুর দুইটার দিকে শোনা গেলো চাচার ভীষণ চিৎকার।

'পেছন দিকে! পেছন দিকে পড়তে হবে লেখাটা! আহ্, কী চালাকই না ছিলেন সাকনুসেম!' দেরি না করে পড়তে শুরু করলেন চাচা—

> *হে দুঃসাহসী পর্যটক! স্নেফেলসের হিমবাহে যে আগুনের জ্বালামুখ, জুলাই মাস শুরু হওয়ার আগেই সেখানে স্কারটারিস পাহাড়ের ছায়া পড়বে। পৃথিবীর কেন্দ্রবিন্দুতে পৌঁছতে গেলে জ্বালামুখে ঝাঁপিয়ে পড়ো। আমিও সেই পথেই গেছি।*
>
> *—আর্নে সাকনুসেম*

চাচা লেখাটা পড়তেই উন্মাদ হয়ে গেলেন যেন। টেবিল-চেয়ারে ধাক্কা খেয়ে, ঘরময় দৌড়ে, হাতের বই আকাশে উড়িয়ে একাকার অবস্থা। 'এক্ষুনি রওনা দিতে হবে!' চেঁচালেন তিনি। 'আর হ্যাঁ, তুইও যাবি আমার সঙ্গে।'

'কিন্তু যাবোটা কোথায়?' উত্তর জানার কোনো ইচ্ছে ছিলো না আমার, তাও প্রশ্ন করলাম।

'কোথায় আবার? পৃথিবীর কেন্দ্রে!'

'উল্টো করে পড়!'